কৃষি নীতি পত্র
বাংলাদেশ
AGRICULTURAL POLICY BRIEF
B A N G L A D E S H

বর্ষ: ১ সংখ্যা: ২
ডিসেম্বর ২০০৯

কৃষিজ রূপান্তর, দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও কৃষিঋণ ব্যবস্থা

ভূমিকা

বাংলাদেশের মতো কৃষি নির্ভর দেশে বেশীর ভাগ কৃষকই হত দরিদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের। কৃষজ উৎপাদনে তাদের মুনাফা এতই কম যে, পরবর্তী ফসল উৎপাদনের জন্য উপকরন কেনার অর্থ তাদের অনেকের হাতেই থাকে না। পাশাপাশি বন্যা, খরা, সাইক্লোন, জলোচ্ছাস কিংবা নদী ভাঙ্গনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ পোকা মাকড় ও নানা রোগ ব্যধির কারনে ফসলহানি ঘটলে তাদের যে কোন উৎস থেকেই হোকা না কেন ঋণ গ্রহণ ছাড়া তাদের কোন উপায় থাকে না। কৃষিজ উৎপাদন অব্যাহত রাখার মাধ্যমে গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বাঁচিয়ে রাখা এবং খাদ্য সার্বভৌমত্ব অর্জণে কৃষি ঋণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই, যে কোন বিচারেই, কৃষি ঋণের বাজার ব্যবস্থা একটি মৌলিক প্রসঙ্গ (issue)।

বর্তমানে দেশে কৃষি ঋণের উৎস হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় উৎস থেকেই কৃষকরা ঋণ গ্রহণ করে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে রয়েছে সরকারী সংস্থা, বেসরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও। অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে রয়েছে চিরায়ত মহাজন, বেপারী এবং ধনী কৃষক। ক্ষেত্র বিশেষে বন্ধু এবং আত্নীয় স্বজনের কাছ থেকেও ঋণ নিয়ে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণে কৃষকদেরকে নানান রকম জটিল প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয় এবং বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখী হতে হয়। এনজিও গুলো এখন ক্ষুদ্র ঋণের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে কাজ করছে। কিন্তু এনজিও ঋণের মূল সমস্যা হচ্ছে কিস্তি পরিশোধ। অনেক সময়েই দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে ঠিক সময়ে কিস্তি পরিশোধ অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন তারা অন্য উৎস থেকে উচ্চ সুদে পুনরায় ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয়। কৃষকরা অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণে বেশী স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। কেননা এখানে অনুষ্ঠানিকতা নেই বললেই চলে। কিন্তু অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের সুদ এত চওড়া যে, কৃষকের উৎপন্ন ফসলের পুরোটাই চলে যায় ঋণ পরিশোধে। কখনো কখনো কৃষকরা তাদের শেষ সম্বল ভূমিটুকু বিক্রি করতে বাধ্য হয় এবং এক সময় হয়ে পড়ে ভূমিহীন।

বাংলাদেশের কৃষকদের জীবিকার উপাদানের মধ্যে রয়েছে সামাজিক, আর্থিক, শারিরীক, ও রাজনৈতিক সম্পদ। আর্থিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে নগদ অর্থ, ঋণ সুবিধা, বিক্রয়যোগ্য গবাদি পশু ও মূল্যবান সম্পত্তি। জীবিকা সম্পদের মধ্যে রয়েছে আর্থিক উৎসের সুবিধা গ্রহণের সুযোগ, যা না থাকলে তাদের জীবিকায় নেমে আসে ভয়াবহ দুর্যোগ। গ্রামে এমনিতেই কৃষকদের আয় খুব কম, ফলে তাদের হাতে নগদ অর্থ থাকে না বললেই চলে। আর অন্য সম্পদও না থাকার মতো-ই। চূড়ান্ত পরিনতিতে তাদেরকে ঋণের উপরই ভরসা করতে হয়।

কৃষি খাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে কৃষকদের ঋণ সু-বিধা কৃষক বান্ধব হতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই। অত্র গবেষণাটির মৌল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে কৃষি ঋণ ব্যবস্থায় যে সব সমস্যা বিরাজমান সেগুলোকে চিহ্নিত করা এবং সমস্যা থেকে উত্তরনের জন্য কি কি নীতি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পাওে তার একটি রূপরেখা তৈরী করা।

কৃষি ঋণের উৎস এবং ঋণ প্রবাহ

সূচনাতেই উলেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে কৃষি ঋণের উৎসকে মূলত দু'টি মূল ধারায় বিভক্ত করা যায়- প্রাতিষ্ঠানিক ও অ-প্রাতিষ্ঠানিক। উভয় ধারায় আবার বেশ কয়েকটি উপ-উৎস রয়েছে যা চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

২০০৮-০৯ অর্থ বছরে (জুলাই ২০০৮ - জুন ২০০৯) বাংলাদেশে কৃষি ঋণ প্রবাহ শতকরা ৭.৬৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষির টেকসই উন্নয়ন, জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের ক্রমবর্ধমান ঋণ চাহিদা পূরণ করার জন্য স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশ সরকার কৃষি ঋণ খাতে বরাদ্দ বাড়াতে থাকে। কৃষকদের ঋণপ্রাপ্তি সহজ করার জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি), রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব), সমবায় ব্যাংক এর মতো বিশেষায়িত ব্যাংক সৃষ্টি করা হয়। বিশেষায়িত ব্যাংকের পাশাপাশি রাষ্ট্রায়িত্ত ৪ টি বাণিজ্যিক ব্যাংক (সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী) এবং বাংলাদেশ পলী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) ও কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণ করতে থাকে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সবচেয়ে বেশী কৃষি ঋণ বিতরণ করে থাকে। দেশে মোট

উন্নয়ন অন্বেষন
Unnayan Onneshan
The Innovators
centre for research and action on development

বাড়ী # ১৯এ, সড়ক # ১৬ (নতুন), ধানমন্ডি
ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: + (৮৮০-২) ৮১৫ ৮২৭৪, ৯১১ ০৬৩৬,
ফ্যাক্স: + (৮৮০-২) ৮১৫ ৯১৩৫
ই-মেইল: info@unnayan.org
ওয়েব: www.unnayan.org

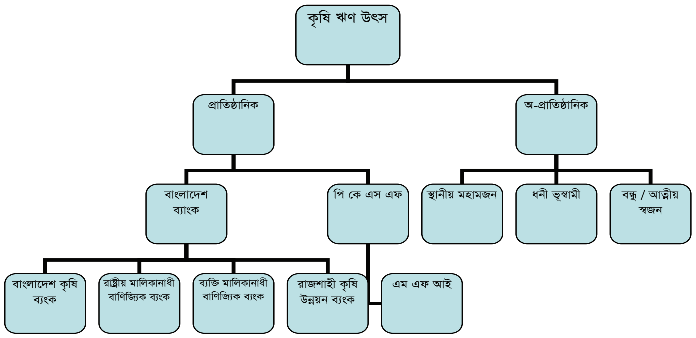

বিতরনকৃত কৃষি ঋণের ৫৩.৪৫% দিয়েছে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক। যেখানে রাষ্ট্রায়িত ৪ টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিতরণ হার ছিল ২২.১৫% (সূত্রঃ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৮, বাংলাদেশ ব্যাংক)। ২০০৮ সালে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের প্রকৃত কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমান ছিল যথাক্রমে ৩২.৯৬ বিলিয়ন টাকা এবং ৭.৬৫ বিলিয়ন টাকা। উপরের প্রতিষ্ঠানগুলো কৃষকদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে কৃষি ঋণ দিয়ে থাকে, যথা- স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী। ঋণ কোন মেয়াদের হবে তা নির্ভর ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য, বাস্ড়বায়নকাল এবং আয় উৎপাদনের সক্ষমতা সৃষ্টির উপর। সাধারণত স্বল্প মেয়াদী ঋণ দেওয়া হয় মৌসুমী শস্য উৎপাদনে। মধ্য মেয়াদী ঋণ দেওয়া হয় কৃষি খামারের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, বিভিন্ন প্রকার সেচযন্ত্র, কৃষিজ যন্ত্রপাতি, গবাদিপশু ক্রয়, ডেইরি ও পোলট্রি খামার তৈরী এবং কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরনে প্রয়োজনীয় যানবাহন ক্রয়ের জন্য। দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ সুবিধা দেওয়া হয় মূলধনী যন্ত্রপাতি যেমন ট্রাক্টর ও সেচযন্ত্র ক্রয়, উদ্যানকর্ষণ, বনায়ন মৎস্য চাষ এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে। ঋণ পরিশোধের সময়কাল ঋণের উৎসভেদে পার্থক্য রয়েছে। যেমন-বিকেবি'র স্বল্প মেয়াদী ঋণের পরিশোধকাল ১৮ মাস, মধ্য মেয়াদী ঋণে ৫ বছর এবং দীর্ঘ মেয়াদী ঋণে ৫ বছরের অধিক।

ঋণ দাতা	বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক মোট বিতরণ	আদায়	মেয়াদী উত্তীর্ণ	খেলাপী	মেয়াদ উত্তীর্ণের কত ভাগ খেলাপী (%)
রাষ্ট্রায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংক	১৮	১৩.৬৬	১৫.০৯	২৬.৩৩	৪৯.৫৭	৫৩.১২
বিকেবি	৩৬.৫	৩২.৯৬	১৩.১৬	২১.০৬	৭৩.৩৪	২৮.৭১
রাকাব	৮	৭.৬৫	৮.৪৫	৭.৭৫	২৫.৫৮	৩০.৩
বিআরডিবি	৭.১১	৭.৩৫	৬.৯৭	২.৪৭	৯.১৬	২৬.৯৭
বিএসবিএল	০.১৪	০.০৫	০.০৮	০.৭৬	০.৮৪	৯০.৪৮
উপ-মোট	**৬৯.৭৫**	**৬১.৬৭**	**৪৩.৭৫**	**৫৮.৩৭**	**১৫৮.৪৯**	**৩৬.৮৩**
বিদেশী ব্যাংক	৩.৬৯	৮.৫৪	৮.০২	০	৩.০১	০
পিসিবি	৯.৬৫	১৫.৬	৮.২৭	০.৫	১৬.৭৩	২.৯৯
উপ-মোট	**১৩.৩৪**	**২৪.১৪**	**১৬.২৯**	**০.৫**	**১৯.৭৪**	**২.৫২**
সর্বমোট	**৮৩.০৯**	**৮৫.৮১**	**৬০.০৪**	**৫৮.৮৭**	**১৭৮.২৩**	**৩৩.০৩**

সারণি ১: ২০০৮ অর্থ বছরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কৃষি ঋণ বিতরণ চিত্র (বিলিয়ন টাকা)

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০৮।

প্রতিষ্ঠান	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯		
							কোয়ার্টার ১	কোয়ার্টার ২	কোয়ার্টার ৩
প্রগ্রাম/লক্ষ্যমাত্রা (জুলাই - জুন)	৩৫.৬	৪৩.৮	৫৫.৪	৫৫.৪	৬৩.৫	৮৩.১	৯৩.৮	৯৩.৮	৯৩.৮
মোট বিতরণ (বিলিয়ন টাকা)	৩২.৭	৪০.৭	৪৮.৯	৫৫	৫২.৯	৮৫.৮	১৫	২৭.৩	২৬.৮
শস্য	১৬.৮	১৮.৪	২০.৯	২২.৩	২২.৯	২৫.৮	৩.৬	১০.৮	১০.১
সেচ	০	০.১	০	০.১	০.১	০.১	০	০.২	০.৩
কৃষি যন্ত্রপাতি	০.১	০.২	০.২	০.২	০.৩	০.৪	০.১	০.২	০.৩
গবাদি পশু	১.৫	২.৫	২.৮	২.৮	২.৭	৪.৫	১.৩	১	১.৩
মৎস্য	০.৬	১.২	১.৩	২.২	২.৪	৩.৯	০.৬	১.২	১.৫
শস্য গুদামজাত এবং বাজারজাত	৩.১	৪.২	৫.৬	৭.৬	০.৫	১.৪	০.৪	০.৩	১.০
দারিদ্র দূরীকরণ	৭.৭	১০.২	১১.৫	১৪	১১.৯	২২.৬	৩.৪	৪.৮	৫.৬
অন্যান্য	২.৯	৩.৯	৬.৬	৮.৭	১২.২	২৭	৫.৫	৮.৯	৬.৬
মোট আদায় (বিলিয়ন টাকা)	৩৫.২	৩১.৪	৩১.৩	৪১.২	৪৬.৮	৬০	১৩.৩	১৭.৩	৩০.০
মোট অনাদায়ী (বিলিয়ন টাকা)	৬৫.২	৬২.৬	৫৭.৮	৬৬.৫	৬৬.৪	৫৮.৯	৬২.৬	৬৪.১	৬২.৫
মোট খেলাপী (বিলিয়ন টাকা)	১১৯.১	১২৭.১	১৪০.৩	১৬১.৮	১৪৫.৮	১৭৮.২	১৭৫.৯	১৮৫	১৮৭.৩
অনাদায়ী অর্থেও % কত ভাগ খেলাপী	৫৪.৭	৪৯.৩	৪১.২	৪১.১	৪৫.৫	৩৩	৩৫.৬	৩৪.৭	৩৩.৩
% বৃদ্ধি (বিগত বছর একই সময়ের থেকে বৃদ্ধি)									
সর্বমোট বিতরণ	১০.৮	২৪.৫	২০.১	১২.৪	-৩.৭	৬২.২	২৪	০.৬	১২.২
মোট আদায়	৮	-১০.৮	-০.৩	৩১.৬	১৩.৫	২৮.৪	১.৭	-৩.৮	১২৩.৫

সারণি ২: কৃষির বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদান চিত্র:

উৎস: ব্যাংলাদেশ ব্যাংক, কোয়ার্টারলি আপডেট, মে, ২০০৯। কৃষি ঋণ বিতরন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হারে হয়েছে। কখনো কম, কখনো বেশী। ২০০৩ থেকে ২০০৬ সালে ঋণ বিতরণের হার ছিল উর্ধ্বমুখী। কিন্তু ২০০৭ সালে আবার কমে যায়। ২০০৬ সালে যেখানে বিতরণ হয়েছে ৫৫ বিলিয়ন টাকা সেখানে ২০০৭ সালে তা হ্রাস পেয়ে হয় ৫২.৯ বিলিয়ন টাকা। ২০০৮ সালে আবার ঋণ বিতরণের পরিমান হঠাৎ করে বড় আকারে বাড়তে থাকে। চলতি অর্থ বছর ১ম ও ২য় কোয়ার্টারে

চিত্র ২: কৃষি ঋণ বিতরন ধারা

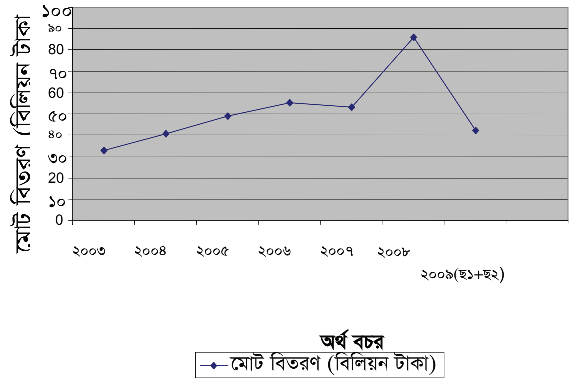

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, কোয়ার্টারলি আপডেট, ডিসেম্বর ২০০৮।

বিতরণের পরিমান ৪২.৩ বিলিয়ন টাকা।

অবশ্য, কৃষি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারেনি। যেমন-২০০৮ সালে ৬৯.৭৫ বিলিয়ন টাকার বিপরীতে প্রকৃত বিতরণ করা হয়েছে ৬১.৬৭ বিলিয়ন টাকা। শস্য, সেচযন্ত্র ক্রয়, গবাদি পশু ও মৎস্য খাতে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম ঋণ বিতরণ হওয়ায় ২০০৮ সালে লক্ষ্যমাত্রা অর্জণে ব্যর্থ হয়েছে। শস্য খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৪.৮% কিন্তু অর্জিত হয়েছে ৪০%। অপরপক্ষে, শস্য বাজারজাতকরণ, দারিদ্র দূরীকরন এবং অন্যান্য কৃষি কাজে ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে (দৈনিক নিউ এইজ, ২০০৯)। কৃষি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন চিত্র নিরূপ:

ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত বিতরণ চিত্র বিশেষণ করলে দেখা যাবে কৃষির বিভিন্ন খাতে তারতম্য রয়েছে। পলী অঞ্চলে রাষ্ট্রায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংকের পর্যাপ্ত শাখা না থাকার কারনে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে কৃষকরা কৃষি ঋণ সুবিধা কম পায়। ১৯৮০ সাল পর্যন্ড় ৬৩% রাষ্ট্রায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা পলী অঞ্চলে ছিল এবং ১৯৮০ ও ১৯৯০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ৭৩% নতুন শাখা পলী অঞ্চলে খোলা হয়েছে। কিন্তু ১৯৯০ পর পলী অঞ্চলে শাখার পরিমান কমাতে থাকে এবং ১৯৯৮ সালে তার পরিমান ৬১% নেমে আসে। কৃষিতে ঋণ প্রবাহ কম হওয়ার অন্যতম কারন হলো পলী অঞ্চলে রাষ্ট্রায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক শাখা না থাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রম

কিছু কৃষি ঋণ বিতরণ প্রোগ্রাম বাংলাদেশ ব্যাংকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে থাকে। মূলত দাতাদের অর্থায়নেই এ সব প্রোগ্রামগুলো পরিচালিত হয় এবং ঋণের টার্গেট গ্রুপ হলো ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষিক এবং কৃষি। এ ধরনের কয়েকটি প্রকল্প হলো:

প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষি খামারের শস্য নিবিড়ীকরন প্রকল্প (Marginal and Small Farm Systems Crop Intensification Project (MSFSCIP)

চিংড়ি চাষে অর্থায়ন স্কিম (Shrimp Culture Financing Scheme)

শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প (Shashya Gudam Rin Prokalpa (SHOGORIP)) এবং ইউরিয়া সার সংক্রান্ড় xpansion of Urea Deep Placement Technology in 80 upazillas of Bangladesh during Boro 2008 প্রকল্প।

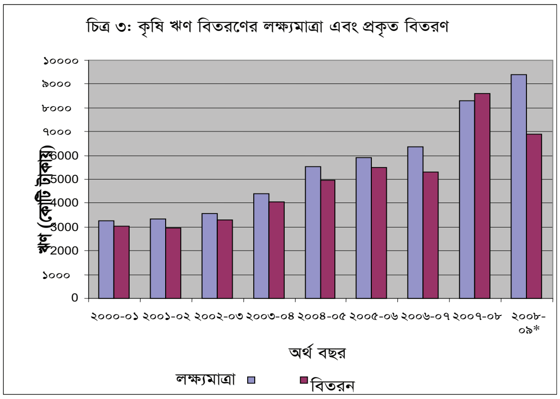

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, কোয়ার্টারলি আপডেট, ডিসেম্বর ২০০৮।

বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় ২০০৮ সালে সর্বমোট ০.৭৪ বিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে এবং এ একই সময়ে ঋণ আদায়ের পরিমান ছিল ০.৪৪ বিলিয়ন টাকা। এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থায়নে পরিচালিত আরেকটি উলেখযোগ্য প্রকল্প হলো: উত্তর-পশ্চিম শস্য বহু-মুখীকরন প্রকল্প (**Northwest Crop Diversification Project)** *। এ প্রকল্পের আওতায় এডিবি* রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংককে কৃষি সুবিধা প্রদানের জন্য অর্থ দিয়ে থাকে। এ প্রকল্পের ক্রেডিট কমপোনেন্টে রাখা হয়েছে ১.২ বিলিয়ন টাকা। এ টাকা থেকে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ১৬ টি জেলার কৃষকরা উচ্চ মূল্যের শস্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরনে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। এখানে এনজিও দেরকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি, পলী অর্থনীতিকে সবল ও সতেজ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ১৪ জুলাই ২০০৯ তারিখে নতুন ঋণ নীতি ঘোষণা করেছে। এ নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো স্বচ্ছ উপায়ে কৃষি ঋণ বিতরণ এবং ঋণ বিতরণ ও আদায়ে যত প্রকার অনিয়ম রয়েছে তা দূরীভুত করা। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে কেন্দ্রিয় ব্যাংক ১১,৫১২.৩০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে। তন্মধ্যে, ৮৪৫৩ কোটি টাকা বিতরণ করা হবে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক সহ ৬টি রাষ্ট্রায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে। ২৯টি

বেসরকারী ব্যাংকগুলো বিতরন করবে ২৫৯৪.৪০ কোটি টাকা। আর ১০ বিদেশী ব্যাংক দিবে ৪৬৪.৯০ কোটি টাকা। তবেএনজিও গুলে যে কৃষি ঋণ প্রদান করবে তার সুদের হার ঠিক হবে সে বিষয়ে কেন্দ্রিয় ব্যাংক সুনির্দিষ্ট কোন ঘোষণা প্রদান করেনি। কৃষি ঋণ বিতরনের জন্য দেশে বিদ্যমান বিদেশী ব্যাংকসহ (যেমন: **Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), Standard Chartered and Citi Bank N.A)** বেসরকারী ব্যাংকগুলোর উপর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। যদিও এসব ব্যাংক বিশ্ব মন্দার কারনে কৃষি ঋণ বিতরনে আগ্রহী নয়। চলতি অর্থ বছরে এইচ এস বি সি ব্যাংক ১৫০ কোটি টাকা এবং স্টান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক ১৭২ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে।

কৃষি ঋণ বিতরণে বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ভূমিকা

বিগত বছরগুলোতে বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কৃষি বিতরনে কোন উলেখযোগ্য ভূমিকা রাখেনি। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে বেসরকারী ব্যাংকগুলে সর্বমোট কৃষি খাতে ৩.৩৪ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে যা উক্ত সময়ে বিতরণকৃত ঋণের মাত্র ৬%। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে ঋণ বিতরনের পরিমান বাড়িয়ে ১১.১৭ কোটি টাকায় উন্নীত হলেও তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে তা আরেকটু বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ২৪.১৪ কোটি টাকা যা মোট বিতরনকৃত কৃষি ঋণের ২৮.১৩%। পলী অঞ্চলে অল্প কয়েকটি বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা থাকলেও বিদেশী কোন ব্যাংকের শাখা নেই।

সারণি ২: শহর ও পলী অঞ্চলে বিভিন্ন ব্যাংকের শাখা

ব্যাংক	ব্যাংক সংখ্যা	শাখা সংখ্যা	
		শহরাঞ্চল	পলী অ ঞ্চল
রাষ্ট্রায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪	১২৩৮	২১৪৬
বিশেষায়িত ব্যাংক	৫	১৫৫	১২০৩
বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক	৩০	১২৯৫	৪৯০
বিদেশী ব্যাংক	৯	৪৯	০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ২: শহর ও পলী অঞ্চলে বিভিন্ন ব্যাংকের শাখা

দেশী/ বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংগুলো শুধু শহর অঞ্চলে শিল্প এবং মুলধনী বিনিয়োগে উৎসাহী। কৃষি ঋণ তাদের অগ্রাধিকার তালিকায় নেই।

সেপ্টেম্বর ২০০৮ এ বাংলাদেশ ব্যাংক এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করে যে, সকল বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক বাধ্যতামূলকভাবে কৃষি ঋণ বিতরণ করবে। ব্যাংকগুলো তাদো মোট ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রায় কৃষি ঋণের জন্য পৃথক বরাদ্দ রাখবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরো জানানো হয় যে, পলী অঞ্চলে যে সব বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকের কোন শাখা নেই তারা এনজিও বা অন্য কোন ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষি ঋণ প্রদান করবে।

এনজিও: গ্রামীণ দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর বিকল্প ঋণ উৎস

টেকসই উন্নয়নে বিশেষ করে দারিদ্র দূরীকরন ও নাগরিক সেবা প্রদানে বাংলাদেশ সরকারের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ফলে এসব ক্ষেত্রে এনজিও গুলো এগিয়ে এসেছে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য এনজিওগুলো ঋণ গ্রহণের প্রধান উৎস হিসাবে দাড়িয়ে গেছে। গ্রামের বেশীরভাগ দরিদ্র জনগণ এনজিও থেকে ঋণ নিতে ইচ্ছুক। কেননা তাদেরকে সহজেই কাছে পাওয়া যায় এবং ঋণ গ্রহণে জটিলতা নেই। বড় বড় ব্রাক ও আশা'র মতো বড় বড় এনজিওগুলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক যে কোন কাজে ঋণ দিয়ে থাকে। বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র নারীকে ঋণ প্রদান করে থাকে। ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ড় আশা সর্বমোট ২৪৯৮০৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে (আশা ওয়েব

চিত্র ৪: বেসরকারী ব্যাংকসমূহের ঋণ বিতর খাতসমূহ

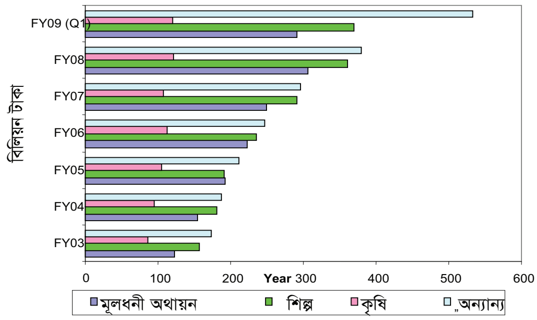

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, কোয়ার্টারলি আপডেট, ডিসেম্বর ২০০৮।

সাইট: www.asa.org.bd)। তাদেও এ ঋণ প্রদানের কারনে গরীব নারী কৃষাণীদেরকে স্থানীয় মহাজনের কাছে উচ্চসুদে ঋণ গ্রহণের জন্য হাত পাততে হয়নি। ব্রাকও কৃষিখাতের বিভিন্ন কাজে ঋণ প্রদান করে থাকে। ২০০৭ সালের ভয়াবহ সাইক্লোন সিডরের পর কৃষি পুনর্বাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ব্রাককে। কোথাও কোথাও তারা বিনামূল্যে সেচ উপকরণ বিতরণ করেছে। তারা শস্য বহুমুখীকরনসহ উচ্চ ফলনশীল জাত চাষের ব্যাপারে উৎসাহিত করে থাকে। বিশেষ কওে কৃষকদের জন্য ব্রাকের 'উন্নতি' নামে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম রয়েছে (ব্রাক বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০৭)

অ-প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ

গ্রামের সবচেয়ে হতদরিদ্র মানুষেরা বিপদে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে। দূর অতীতে বা কিংবা এখনো নিভৃত পলীতে অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ উৎস বলতে মহাজন, স্বর্ণাকার এবং বেপারী/বণিকদেরকেই বুঝাতো। কারণ প্রাতিষ্ঠান উৎস থেকে ঋণ গ্রহণের সুযোগ তাদের ছিল না। বরং অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলো ছিল হাতের কাছে, চেনাজানা এবং ঋণগ্রহণেও কোন জটিলতা নেই।

বেপারীরা যারা সংখ্যায় কম হলেও তারা গ্রামে ধান সংগ্রহ করে এবং বিনিময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনের নিরিখে চাল ও মুদি সামগ্রী

সরবরাহ করে। ধানের বেপারীর ধানের উপর ঋণ দিয়ে থাকে। অনেক সময় তারা সরাসরি কিংবা তাদের নিজস্ব বলয়ের ক্ষুদ্র বেপারীর মাধ্যমে কৃষকদের এই ঋণ দিয়ে থাকে। স্থানীয় মহাজনেরা খুবই গুরুত্বপূর্ন এবং প্রভাবশালী। বিপদের সময় তাদেরকেই দরিদ্র জনগোষ্ঠী কাছে পায়। প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণগ্রহণ এতই জটিল এবং আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ যে, কৃষকরা বাধ্য হন মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণে। এনজিও গুলো এ ক্ষেত্রে এগিয়ে এলেও তাদের সুদের হার খুবই বেশী এবং কিস্তি পরিশোধ করা অত্যন্ত দূরহ। এমনকি কখনো কখনো এনজিও ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নীতি এবং দরীদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা

সবুজ বিপবের পর কৃষকরা দেখল আশ্চার্যজনক বোরো ও আমনের ধান বীজ যার উৎপাদন ক্ষমতা স্থানীয় জাতের ৩ গুন। উচ্চ ফলনশীল ধানের নাম হয়ে গেল ইরি (IRRI)। আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠী এ ক্ষেত্রে সন্দিগ্ন ভূমিকা পালন করতে থাকলো।

তারা উচ্চ ফলনশীল জাত (HYV) তৈরীতে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অর্থায়ন করতে থাকলো এবং সেচ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য ঋণ প্রদানে উৎসাহ প্রদান করলো যাতে করে কৃষির এই নতুন প্রযুক্তি কৃষকরা গ্রহণে উৎসাহিত হয় এবং তাদের সক্ষমতা তৈরী হয়। কিন্তু যে সময় কৃষকদের ভতুর্কি বেশী প্রয়োজন সে সময় দাতাগোষ্ঠী অযৌক্তিভাবে কৃষিখাতে সরকারের ভতুর্কির পরিমান হ্রাস করার জন্য চাপ দিতে লাগলো। এই সময় থেকেই বিশেষত বিশ্বব্যাংক ও আমেরিকান দাতা সংস্থা (USAID) কৃষিতে সহাযতা হ্রাস করতে এবং কৃষির উৎপাদন উপকরণ উম্মুক্ত বাজারে খুলে দেওয়ার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান করতে থাকে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC) এর সার বিতরণ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিল। বেসরকারী খাতকে কৃষি যন্ত্রপাতি আমদানী এবং কৃষি উপকরন বিতরণের সুযোগ দেওয়া হলো। সবুজ বিপবের ফলে দ্রুত খাদ্যের দাম কমতে থাকলো। এই অযুহাতে দাতারা পুনরায় কৃষি খাতে বিশেষ করে গবেষণ ও সেচে সরকারের সহায়তা হ্রাস করতে বললো। ঐ সময় থেকে বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) ও এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক ADB এর মতো আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলোর কাছে কৃষি হয়ে পড়লো নোংরা ক্ষেত্র।

বাংলাদেশে IMF এর অনুপ্রবেশ ঘটে অর্থনীতি পুনর্গঠনের কথা বলে। তাদের নীতি কাঠামো বাংলাদেশের কৃষকদের বিপর্যয় ডেকে এনেছে এবং অর্থনীতির সংকট বহুগুনে বৃদ্ধি করেছে। তারা বিরাজমান দারিদ্র দূরীকরনে কোন কার্যকর অবদানতো রাখতে পারেইনি বরং অনেক ক্ষেত্রে তারা সমাজে বৈষম্য বৃদ্ধি করেছে। বিশ্বব্যাংকের অনেক প্রকল্পের কারনে দেশে,বেকার ও ভূমিহীনের সংখ্যা বেড়েছে। অনেকদিন ধরেই আই এম এফ বাংলাদেশের কেন্দ্রিয় ব্যাংককে পরামর্শ দিচ্ছে মুদ্রা সরবরাহ হ্রাস করার জন্য। তাদের এই প্রেসক্রিপশন মান হলে অর্থনীতিতে মুদ্রা প্রবাহ কমে যাবে এবং ফলশ্রুতিকে ঋণের পরিমানও হ্রাস পাবে। যদি ঋণ প্রবাহ ব্যাংকগুলো হ্রাস করে তবে সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে কৃষি খাত।

বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এর নীতি গরীবদেরকে আরো ঋণগ্রস্ত করে তুলেছে এবং দেশকে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়াকে বাধাগ্রস্থ করেছে। বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের প্রদর্শিত পথ অন্ধের মতো অনুসরন না করে প্রয়োজন কৃষিতে অধিক বিনিয়োগ এবং সহায়তা প্রদান। তবেই দারিদ্র দুরীকরন এবং সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা অর্জণ করা সম্ভব হবে।

কৃষি ঋণ গ্রহণে কৃষকদের পছন্দক্রম

সময়ের পরিক্রমায় অন্যান্য পারিপার্শ্বিক কারণে কৃষকদের ঋণ গ্রহণের পছন্দক্রমে পরিবর্তন এসেছে। পূর্বের একচেটিয়া মহাজন, বোপরী বা ধনী ভূস্বামীদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের চেয়ে কৃষকার এনজিওদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণে কিছুটা স্বাচ্ছন্দবোধ করে। এর বেশ কয়েকটি কারন গবেষণায় তথ্য সংগ্রহকালে জানা গেছে:

১. আশা, ব্রাক এবং গ্রামীণ ব্যাংকের মতো বড় বড় এনজিওগুলোর পাশাপাশি অনেক এনজিও'র শাখা প্রত্যন্ত গ্রামে পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে এনজিও থেকে কৃষকদের ঋণ গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেখানে তাদের প্রবেশাধিকার তৈরী হয়েছে।

২. অনেক জায়গায় কৃষি ঋণ গ্রহণের জন্য ব্যাংকিং সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কৃষকরা এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণে সাচ্ছন্দবোধ করে। ব্যাংক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সুদের হার এনজিও থেকে নিু হওয়া সত্ত্বেও এসব উৎস থেকে ঋণ গ্রহণে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারছে না। এর তিনটি মূল কারন চিহ্নিত করা গেছে:

(ক) ব্যাংকগুলোতে ঋণ গ্রহণে বন্ধক/জামানত রাখা বাধ্যতামূলক যা দরিদ্র কৃষকের নেই।

(খ) ঋণ গ্রহণের আবেদনটি এত জটিল যে অশিতি কৃষকদের পে পূরণ করা অসম্ভব

(গ) ঋণ পেতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। অনেক সময় ঋণ পাওয়া যায় কাঙ্খিত সময়ের অনেক পরে। তাছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ যথেষ্ট জটিল ও আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ। অনেক পথ পাড়ি দিয়ে কৃষকরা ব্যাংকে গেলেও যে নির্ধারিত দিনে ঋণ পাবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই।

৩. ব্যাংক থেকে এনজিওগুলোর ঋণ প্রদানে সময় অনেক কম লাগে। কৃষকরা যখনই চাবে এনজিওগুলো তখনই ঋণ দিয়ে থাকে।

৪. মহাজন বা বেপারী থেকে এনজিওগুলোর সুদের হার কম এবং এখানে শোষণের সুযোগও কম।

প্রত্যেক ঋণ উৎসেরই কিছু সুবিধা-অসুবিধা রয়েছে। অত্র গবেষণাপত্রে কৃষি ঋণের বিভিন্ন উৎসের প্রাসঙ্গিকতা ও কৃষকদের জীবন-জীবিকার উপর এর প্রভাব নিয়ে

আলোচনা করা হবে।

কৃষি ঋণ ব্যবস্থা এবং দরিদ্র কৃষকদের জীবন

নিভৃত পলীতে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা না থাকার কারনে দরিদ্র কৃষকরা প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা পায় না এবং চূড়ান্ড়ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় কৃষিখাত এবং ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন কৃষকরা। বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর পলীতে শাখা খোলাতে অনীহা পলী এলাকায় ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। দরিদ্র কৃষকদের এমনিতেই কোন সঞ্চয় থাকে না। যদিও কখনো সঞ্চয় করে তা পারিবারিক অন্য প্রয়োজনের জন্য, উৎপাদনের জন্য নয়। ফলে কৃষি উৎপাদনে আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হলে তারা আবশ্যিকভাবে ঋণের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কৃষকদের স্বল্প/শূণ্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তাদেরকে আর্থি সম্পদের প্রবেশাধিকারকে বাধাগ্রস্থ করে এবং চূড়ান্ড় পরিনতিতে তা তীব্র দারিদ্র এবং বঞ্চনার কারন হয়ে দাড়ায়। নিচের চিত্রে কৃষি ঋণ বাজারের ঋণ প্রবাহের স্বল্পতা এবং কৃষকদের জীবনে তার প্রভাবকে তুলে ধরা হয়েছেঃ

চিত্র ৬: কৃষি ঋণ বাজারে ঋণ প্রবাহের স্বল্পতা এবং কৃষকদের জীবনে তার প্রভাব

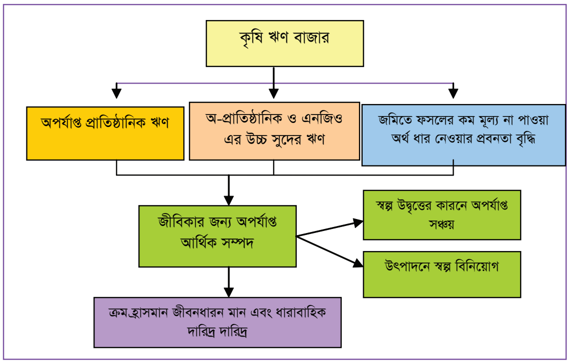

কৃষি ঋণ: শর্ত, সুদের হার এবং পরিশোধ পদ্ধতি

ঋণের শর্ত: প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হলে বেশ কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো বন্ধক/জামানত। ঋণের বিপরীতে কৃষকদেরকে আবশ্যিকভাবে কোন সম্পদ জামানত হিসাবে রাখতেই হয়। ঋণ গ্রহণের আবেদনের সাথেই তাদেরকে সেই 'জামানত/বন্ধক সম্পত্তির দলিল দাখিল করতে হয়। ঋণ মঞ্জুরের প্রক্রিয়াও খুব জটিল, আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ এবং দীর্ঘসুত্র। দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে জামানত রাখা এবং সমগ্র প্রক্রিয়া অনুসরন করে কাঙ্ক্ষিত সময়ে ঋণ পাওয়া প্রায়ই হয়ে ওঠে না।

ঋণ আদায়: আমরা সব সময়ই লক্ষ্য করেছি যে প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলোর আদায় পরিস্থিতি খুব একটা ভালো নয়। নিচের চিত্রে ঋণ বিতরন এবং আদায় পরিস্থিতির অবস্থা চিত্রিত করা হয়েছেঃ

বিগত বছরগুলোতে কৃষি ঋণ আদায়ে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করা হয়নি। স্বল্প আদায়ের অন্যতম কারন কৃষকদের মাঝে ঋণ পরিশোধের প্রকৃত তথ্য না পৌছানো। ২০০৮ অর্থ বছরে আদায় পরিস্থিতি ভালো হওয়ার কারন ঐ সময় ঋণ আদায়ে নানান কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল। যেমন: বিশেষ আদায় অভিযান; ঋণ গ্রহীতাদের সাথে আলাপ-আলোচনা; বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ করা, অনাদায়ী ঋণ পরিশোধ করার জন্য নোটিশ জারী করা ইত্যাদি। অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ফসলহ-ানি ঘটলেও কৃষি ঋণ আদায় কম হয়।

চিত্র ৭: বছর ভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়

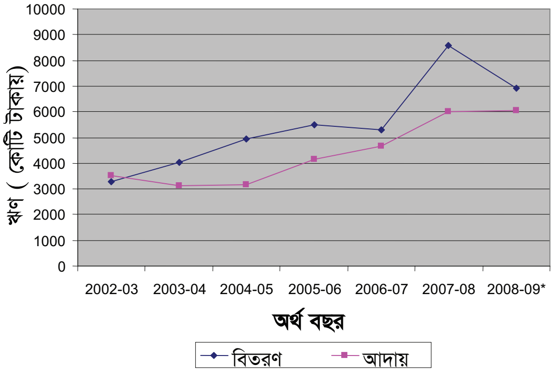

উৎস: বাংলাদেশ ইকোনোমিক রিভিউ, ২০০৯।
*** মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত।**

শস্য বীমা: প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিপরীতে বাংলাদেশে কোন শস্যবীমা পদ্ধতি প্রচলিত নেই। প্রতি বছর কৃষকরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে মারাত্নক ফসলহানির সম্মুখীন হন। পৃথিবীর অনেক দেশেই শস্যবীমা পদ্ধতি চালু রয়েছে। বাংলাদেশেও 'স-াধারণ বীমা কর্পোরেশ' পরীক্ষামূলকভাবে শস্যবীমা পদ্ধতি চালু করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু অভিজ্ঞতা সুখকর হয়নি। কৃষকদের ক্ষতিপূরণের চেয়ে প্রিমিয়ামের পরিমান ছিল অত্যন্ড় কম। সাধারন বীমা অন্য বেসরকারী বীমা কোম্পানীগুলোর জন্য বীমা হিসাবে কাজ করে। সাধারন বীমা সত্যি সত্যি যদি কৃষি উন্নয়নের জন্য শস্যবীমা চালু করতো তবে তারা তাদের লভ্যাংশের এশটি অংশ শস্যবীমার জন্য নির্ধারণ করলে দরিদ্র কৃষকদের কাজে আসতো। ১৯৯৪ সালে শস্য বীমা লাভজনক হবে কিনা তার প্রাক-মূল্যায়নের জন্য জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছিল। কমিটি তাদের প্রতিবেদনে বলেছে বাংলাদেশে শস্যবীমা চালু করা যথেষ্ট সমস্যাপূর্ণ হবে। যেহেতু বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবন দেশ সেহেতু বেসরকারী ব্যাংক বা বীমা কৃষি ঋণ প্রদান বা শস্যবীমায় বিনিয়োগ করতে মোটেও উৎসাহী নয়। যেমন ২০০৭ সালে সিডরেই ১.৭ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি সাধন করেছে যার বেশীর ভাগই হলো শস্যহানির ক্ষতি।

এনজিও ঋণের উচ্চ হারের সুদ: গবেষণায় এটি পুন:প্রমাণিত হয়েছে যে, এনজিওগুলোর সুদের হার অতি উচ্চ। এনজিও ঋণের আরেকটি সমস্যা হলো ঋণ প্রদান করা হয় স্বল্প সময়ের জন্য। কৃষি ঋণ হতে হবে অগ্রিম প্রদান। কৃষকরা উক্ত ঋণ বিনিয়োগ করবে এবং নির্ধারিত সময়ে তার ফেরত দিবে। দরিদ্র

কৃষকরা সাধারনত ঘরে ফসল ওঠার পর তা পরিশোধে সক্ষম হয়। এনজিও দের ঋণ গ্রহণের পর পরই আদায় কিস্তি শুরু হয় এবং অনেক সময়ই কৃষকরা কিস্তি পরিশোধ করতে পারে না। তখন তারা অন্য এনজিও বা অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। ফলে তারা আরো ঋণের জালে আটকাতে থাকে। নীচের বক্সে এমনি একজন দরিদ্র কৃষকের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে।

বঙ ১: ঋণের চক্রে জীবন

কুমিলার শ্রীমান্তপুরের ভূমিহীন কৃষক জসিম। বসল চাষের সময় বর্গা করে এবং অন্য সময় দিন মজুরের কাজ করে। বোরো আবাদের প্রাককালে সে এশটি এনজিও থেকে ১০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে যার সাপ্তাহিক কিস্তি ছিল ৬০ টাকা। ৫ মাসের মধ্যে তার সমুদয় ঋণ পরিশোধের কথা। এই সময়ে হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ফলে কিস্তি পরিশোধের জন্য সঞ্চয়র করার পরিবর্তে চিকিৎসা ও পরিবারের ভরনপোষণ বাবদ ব্যয় আরো বাড়লো। যখন তার কিস্তি পরিশোধের সময় আসলে তখন সে বাধ্য হলো আরেকটি এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণে।

তথ্যসুত্র: গ্রাম সমীক্ষা

অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন ও বাস্তবতা: গ্রামীন জনপথে দারিদ্র টিকিয়ে রাখার জন্য মহাজন ও বেপারীদের স্বার্থ রয়েছে। কারন, তারা চান না কৃষকদের হাতে প্রযুক্তি পৌছাক এবং কৃষকরা সাবলম্বী হোক। মহাজনদের কাছ থেকে নেওয়া সুদের হার অতি উচ্চ। একজন মহাজনদের কাছে যে পরিমান ঋণ গ্রহণ করে পরিশেষে ঐ দরিদ্র কৃষককে সুদাসলে দ্বিগুন অর্থ ফেরত দিতে হয়। অনেক সময় ঋণগ্রস্থ কৃষককে তার শেষ সম্বল ভিটে মাটি পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়। বক্স-২ এর বর্ণনা সেরকমেরই একটি জীবনচিত্র।

বক্স-২: মহাজন- কাছের ও ঋণ গ্রহণের শেষ আশ্রয়

টাঙ্গাল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার বাংলাদেশের সাধারণ একজন দরিদ্র নারী। সবজি উৎপাদন করে। সে স্থানীয় একটি এনজিও থেকে ঋণ নেয়। জামানত রাখার মতো কোন সম্পদ না থাকায় সে ব্যাংক যায়নি ঋণের জন্য। আসমার কথায়, " সুদের হার এত বেশী যে আমার পরে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ অসম্ভব হয়ে পড়েল। এক পর্যায়ে আইনগত সমস্যার হাত থেকে বাচাঁর জন্য স্থানীয় মহাজনের কাছে হাত পাতলাম ঋণের জন্য। ঋণ পেলার। ফসল ফললো। কিন্তু ফসল আমার ঘরে না উঠে উঠল মহাজনের ঘরে। আমার ঘর রইল শূণ্য।"

অনুলেখযোগ্য সমবায়: কৃষিতে সমবায়ের অবদান উলেখ করার মতো নয়। স্থানীয় সমবায় সমিতিগুলে কৃষি ঋণ প্রদানে কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। তাদের ঋণ ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা নেই এবং নেই প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ্য। গ্রামাঞ্চলে একদিকে যেমন কৃষক সমবায় সমিতির সংখ্যা কম অন্যদিকে যা-ও আছে তাদের নেই আর্থিক সক্ষমতা।

বক্স৩: সমবায় সমিতি ও ঋণ প্রদান

কুমিলা জেলার শ্রীমান্তপুর গ্রামের আব্দুল কুদ্দুস, মোক্তার হোসেন, জসিম এবং আরো কয়েকজন কৃষক মিলে তাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয় দিয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। সমিতির কোন সদস্য আর্থিক বিপর্যয়ে পড়লে সমিতি থেকে ঋণ দেওয়া হয়। কিন্তু অধিকাংশ কৃষকই কোন কোনভাবে সমস্যায় পড়ে এবং ঋণ প্রদানের জন্য অনুরোধ করে। ফলে এত সদস্যকে ঋণের প্রদানের আর্থিক সামর্থ সমিতিটির এখনো হয়নি।

তথ্যসুত্র: গ্রাম সমীক্ষা

একটি চিরায়ত সমবায় সমিতির রূপ তুলে ধরা হলো। প্রাতিষ্ঠানিক ও অ-প্রাতিষ্ঠানিক উভয় উৎস থেকেই ঋণ গ্রহণে কৃষকরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং ঋণ বাজারে প্রয়োজনীয় পরিমান কৃষি ঋণ আসছে না। এ বিষয়গুলো জরুরী ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়েছে।

নীতি পরামর্শ

বর্তমান সরকার কৃষি এবং কৃষককে সহায়তার জন্য নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। রাসায়নিক সারের দাম বেশ কিছুটা কমিয়েছে। সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে বিশেষত বোরো ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করা। বাংলাদেশে কৃষি ঋণ ব্যবস্থায় পরিবর্তন একান্তভাবে আবশ্যক। পুরো ঋণ ব্যবস্থা হতে হবে দরিদ্র কৃষক বান্ধব। কারন তারাই কৃষি ঋণের উপর বেশী নির্ভরশীল। প্রাতিষ্ঠানিক ও অ-প্রাতিষ্ঠানিক উভয় পদ্ধতির এমনভাবে সমন্বয় করা প্রয়োজন যাতে কৃষকরা তাদের পছন্দসই মাধ্যম কম জটি-লতায়, প্রতারণামুক্তভাবে এবং সময়মত ঋণ সুবিধা পেতে পারে। কৃষিতে অর্থায়ন পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য নিম্নবর্ণিত নীতি পরামর্শ সরকার বিবেচনা কর্তৃক বিবেচিত হতে পারেঃ

(ক) ব্যাংকিং খাত

ব্যাংকি খাতের ধারাবাহিক উন্নয়ন করতে হবে। ব্যাংকের সেবার মান, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ত্বরন্বিত করতে হবে। মূলধন বাজার অধিকতর নমনীয় করা যেতে পারে এবং একটি সার্বভৌম ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু করা যেখানে কৃষি ও অ-কৃষি উভয় ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো ঋণ দিবে।

কার্যকর পরিবীক্ষণ এবং একটি যুগোপোযোগী মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা, যাতে ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি পায় ও ব্যয়সাশ্রয়ী পন্থা উদ্ভাবন করা।কৃষি ঋণ বিতরণ তত্ত্বাবধানকে অধিকতর শক্তিশালী করা

(খ) অ-প্রাতিষ্ঠানিক/অ-ব্যাংকিং খাত

বাস্তব সম্মত কারনে অনেক সময় প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ প্রাপ্তি সম্ভব নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস টিকে থাকবে। তাছাড়া ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধে একটু গরিমসি থাকেই এবং এক উৎসের ঋণ পরিশোধে আরেক

উৎসের দিকে ধাবিত হয়। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরী করা যাতে করে কৃষকরা ঋণজালের ফাদে আটকে না পরে। মহাজনদের নিয়ে একটি সমায়ের মতো গঠন করা যেতে পারে। তারা ঋণ বিতরণ ও আদায়ে কিছু সার্বজনীন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যেন কেহ খেলাপী না হতে পারে। কোন কারনে খেলাপী হলে ঋণগ্রহীতার সক্ষমতা তৈরীতে সহযোগিতা করা। যেমন কোন ভুমিহীন বা দরিদ্র কৃষক খেলাপী না হয় তার জন্য উক্ত ঋণগ্রহীতাকে কৃষি শ্রমিক হিসাবে হলেও কাজের সুযোগদান। কিংবা ঋণগ্রহিতা কৃষক যেন উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় তার চেষ্টা করা।

ঋণ দাতারা সময়ে সময়ে ঋণগ্রহীতা কৃষককে পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখবে, সময়ে সময়ে পরামর্শ প্রদান করবে। মহাজনরা শুরুতে পরীক্ষামূল ঋণ সুবিধা দিয়ে তার সক্ষমতা পর্যালোচনা করে ঋণ প্রদান করতে পারে। ঋণগ্রহিতা কৃষক সম্পর্কে সামগ্রিক অবস্থার তথ্য সমিতিকে অবহিত করা। প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলো মহাজনদেরকে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় এনে কৃষকদের মাঝে ঋণ প্রদানের চ্যানেল হিসাবে ব্যবহার করতে পারে।

(গ) প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

কৃষকদেরকে ঋণ প্রদানের আগে প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলো কৃষকদের পরিকল্পনা শুনে কৃষকদের ঋণ ব্যবহারে পরামর্শ দিতে পারে এবং সাধারণ যে সব ফসলে লাভ হওয়ার সম্ভাবন প্রবল সেখানে বিনিয়োগ করতে পারে। ঋণ প্রদানের পর পরীক্ষণ অব্যাহত রাখা জরুরী। পরিবেক্ষণ ইউনিট চালু করা যেতে পারে। সাধারণত হতদরিদ্র কৃষকরা ঋণ গ্রহণ করে উৎপাদন কাজে ব্যয় না করে অন্যান্য পারিবারিক কাজে ব্যয় করে ফেলে। ফলে তারা আরো ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে। এ ধারা থেকে তাদেরকে কোন কার্যকর উপায়ে বের করে আনতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলোর ঋণ ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। নিরক্ষর ঋণগ্রহিতা কৃষকরা যাতে ঋণের একটি হিসাব রাখতে পারে তজ্জন্য এনজিও'র মাধ্যমে শিক্ষিত কৃষকদের নিয়ে ছোট ছোট গ্রুপ করে দেওয়া যায়। এই গ্রুপগুলো নিরক্ষর কৃষকদেরকে হিসাব সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান করবে। প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের ঋণ প্রদানকে সহজীকরণ যদি কোন কৃষক ঋণ গ্রহণ করে উৎপাদন কাজে লাভজনকভাবে ব্যবহার করতে পারে তবে ঐ কৃষককে প্রণোদনা মূলক ঋণ দেওয়া যেতে যেখানে সুদের হার হবে পূর্বের সুদের চেয়ে নিম্ন। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীনে শস্য বীমা চালু করা এবং যে সব এলাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ সেসব এলাকা শস্য বীমা কর্মসুচির জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা।

(ঘ) কৃষক সময় সমিতি

কৃষক সমবায় গঠন করে তার মাধ্যমে কৃষি ঋণ প্রদান। কোরিয়ার অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে। কৃষি ব্যাংক কৃষকদের নিজস্ব সমবায় সমিতির মাধ্যমে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কৃষক সমবায় সমিতি গঠনে সংস্কার আনয়ন করা। সমবায় সমিতিগুলো ঋণ প্রবাহ সৃষ্টি করার পাশাপাশি নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে পারে:

(ক) কৃষকদের সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য সমিতি সদস্য-কৃষকদের কাজ থেকে জমা গ্রহণ

(খ) সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরণের জন্য কৃষি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও থেকে মূলধন সংগ্রহ করা

(গ) সমবায়গুলো সদস্যদের সকল প্রকার চাহিদা ও চরিত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকবে

(ঘ) ভুমিহীন/ক্ষুদ্র/ প্রান্তিক কৃষকদের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(ঙ) সমবায়গুলো ভুমিহীন/ক্ষুদ্র/ প্রান্তিক কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

(চ) সমবায়গুলোর দু'টি পৃথক বিভাগ থাকতে পারে। একটি বিভাগ শুধু ঋণ নিয়ে কাজ করবে। অন্যবিভাগ কৃষি উপকরন সরবরাহ, বিতরন এবং শস্য বাজারজাতকরনের বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করবে।

৫. প্রাতিষ্ঠানিক বা অ-প্রাতিষ্ঠানিক যে উৎস থেকেই হোক না কেন কৃষি ঋণে সুদের হার হবে সর্বনিম্ন।

(ছ) শস্যবীমা

উন্নত দেশগুলোতে বিভিন্ন ধরনের শস্য বীমা স্কিম চালু রয়েছে। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলংকায় শস্যবীমা স্কিম চালু রয়েছে। শস্যবীমা স্কিম চালুর প্রাক্কালে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর দিকে নজর দিতে হবেঃ

(ক) যাদের জন্য শস্যবীমা তাদের স্কিম সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারনা থাকতে হবে

(খ) শস্য বীমার সকল প্রক্রিয়াটি এমন হবে যে কৃষকরা তা সহজে বুঝতের পারে এবং যতদূর সম্ভব আনুষ্ঠানিকতা ও সময় ক্ষেপন পরিহার করতে হবে।

(গ) শস্যবীমা স্কিমকে টিকে থাকতে সরকার সহায়তা প্রদান করবে

(ঘ) পরীক্ষামূলকভাবে প্রকল্প চালু করে তার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে মূল প্রকল্পের নকশা তৈরী করতে হবে এবং প্রকল্পে গবেষণার সুযোগ রাখা প্রয়োজন

(ঙ) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ, নিবেদিত প্রাণ কর্মবাহিনী তৈরী করতে হবে।

খাত	সমস্যা	সমাধান	নীতি কৌশল
অ-প্রাতিষ্ঠানিক খাত	♣ উচ্চ সুদের হার ♣ খেলাপী ঋণ	♣ খেলাপী না হওয়ার জন্য প্রাক-সর্তকমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ	♣ কৃষি ঋণের জন্য সরকারী অর্থ প্রবাহ কৃষকদের মাঝে বিতরনের জন্য এই খাতকে মধ্যস্থাকারী হিসাবে গড়ে তোলা
প্রাতিষ্ঠানিক উৎস (সরকারী)	♣ উচ্চ সুদের হার ♣ জামানতের বাধ্যকতা ♣ ঋণ দানের জটিল প্রক্রিয়া ♣ গ্রামীন প্রভাবশালীদের বলয়ভুক্ত ♣ স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়ার জন্য ভর্তুকির ব্যবস্থা না থাকা ♣ পলী অঞ্চলে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা ব্যয়বহুল	♣ ঋণ প্রদানের পূর্বে প্রকল্প ভালোভাবে যাচাই করা ♣ নিয়মিতি পরিবীক্ষণ ♣ পলী অঞ্চলে শাখা খোলা ♣ ঋণ বিতরণ ও আদায় প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ	♣ পরিবীক্ষণের জন্য স্বতন্ত্র ইফনিট/সংস্থা ♣ কৃষকরা ঋণ উৎপাদন কাজে ব্যবহার করলে প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা ♣ ব্যাংক বা এনজিও ঋণ কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের প্রদান
প্রাতিষ্ঠানিক উৎস (বেসরকারী)	♣ পর্যাপ্ত নয় ♣ দীর্ঘমেয়াদে টেকসই নয় ♣ একেবারে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে পৌছায় না।	♣ পলীতে শাখা খোলাকালে প্রয়োজনে সরকারী সহায়তা ♣ ঋণদান কালে দীর্ঘ মেয়াদী রূপকল্প তৈরী রাখা ♣ সবচেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দোড়গোরায় পৌছানের লক্ষ্য রাখা	♣ ঋণ কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের প্রদান ♣ বিদেশী দাতাদের কাজ থেকে প্রয়োজনে অর্থ গ্রহণ অনুমোদন করা যেতে পারে

নীতি ছক

উপরোক্ত প্রস্তাবিত নীতি কৌশল বাস্তবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত এ্যাডভোকেসি এজেন্ডা নির্ধারিত হতে পারে:

১। বাংলাদেশ ব্যাংক এ মর্মে বিধান করতে পারে যে, সেসব ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান পল্লী অঞ্চলে শাখা খুলতে ইচ্ছুক নয় তারা এনজিও'র মাধ্যমে পল্লীতে কৃষি ঋণ বিতরণ করবে। অবশ্য, এ পদ্ধতি সুদের হার আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। সেক্ষেত্রে অর্থ লগ্নিকারী ব্যাংক, বাস্তবায়কারী এনজিও এবং বাংলাদেশ ব্যাংক একত্রে বসে সর্বনিম্ন সুদ হার নির্ধারণ করে দিতে পারে।

২। সহজ প্রক্রিয়ায় এবং সঠিক সময়ে ঋণ প্রদান নিশ্চিত করা।

৩।এনজিওদের ঋণের কিস্তি আদায়ের বর্তমান পদ্ধতি কৃষক বান্ধব

নয় এবং এটি আবশ্যিকভাবে পরিবর্তন করা

৪। জামানতের বর্তমান পদ্ধতি অবশ্যই পরিবর্তন করা।

উপসংহার

কৃষি ও কৃষকদের প্রকৃত কল্যান নিশ্চিত করতে হলে দরিদ্র কৃষকদেরকে সহজ শর্তে ও উপায়ে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা বাড়াতে হবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের অবস্থান হবে শক্ত আর সরকারের ভূমিকা থাকবে সহায়কের। বর্তমান কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ে চিহ্নিত সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার পূর্ব শর্ত হলো কৃষির উন্নযন। আর হত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উৎপাদের ধরে রাখার অন্যতম উপায় হলো সরকার কর্তৃক ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করা এবং সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্ত রাখা।

উন্নয়ন অন্বেষণ
Unnayan Onneshan
The Innovators
centre for research and action on development

নীতিপত্র (Policy Brief) উন্নয়ন অন্বেষণ (Unnayan Onneshan- The Innovators) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত। মূল তত্ত্বাবধায়ক: রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। মেহরুন ইসলাম চৌধুরী প্রণীত গবেষণা প্রতিবেদন The agrarian Transition and the Livelihoods of the Rural Poor:

Oxfam

Agricultural Credit Market অবলম্বনে বাংলা ভাষায় অনুদিত ও সংক্ষেপিত আকারে বর্তমান সংখ্যাটি প্রস্তুত করেছেন দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর। সংখ্যাটি প্রকাশ করেছেন এম নজরুল ইসলাম, সদস্য সচিব, উন্নয়ন অন্বেষণ। সংখ্যাটি অক্সফাম জিবি এবং উন্নয়ন অন্বেষণ-এর যৌথ কর্মসূচীর অংশ হিসাবে প্রকাশিত। মূল গবেষণাপত্রের ইংরেজী সংস্করণ পাওয়া যাবে www.unnayan.org

অক্সফাম গুরুত্ব প্রদান করে লিঙ্গ সমতায়, দুর্যোগের প্রস্তুতিগ্রহণে এবং মানুষকে এমনভাবে সাহায্য করা যাতে তারা একটি নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারে এবং আদিবাসীদের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত হয়। সমতাভিত্তিক ও ন্যায়ানুগ জলবায়ু অবস্থা, ন্যায়ানুগ বাণিজ্য বিধান এবং ক্ষুদ্র উৎপাদন গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দানের মাধ্যমে দেশে/বিদেশে তাদের উৎপাদন বাজারজাতকরনের মাধ্যমে নিশ্চিত আয় অর্জনেও অক্সফাম কাজ করে।

উন্নয়ন অন্বেষণ- দি ইনোভেটরস একটি স্বাধীন অলাভজনক নিবন্ধনকৃত ট্রাষ্ট। এর লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়ন চিন্তা, গবেষণা, এডভোকেসি, সংহতি এবং কর্ম পরিকল্পনা উদ্ভাবনে ভূমিকা রাখা।

স্থানীয়, জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে বুদ্ধিবৃত্তিক দারিদ্র, অন্যায়, লিঙ্গ বৈষম্য এবং পরিবেশ বিপর্যয় সম্পর্কে সমাধান বের করতে ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই বিকল্প গননীতি পর্যবেক্ষণ সংস্থাটি ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কেন্দ্রের গবেষণা দর্শন ও মডেল হচ্ছে বহুমাত্রিক, অংশগ্রহণমূলক এবং টেকসই উন্নয়ন।